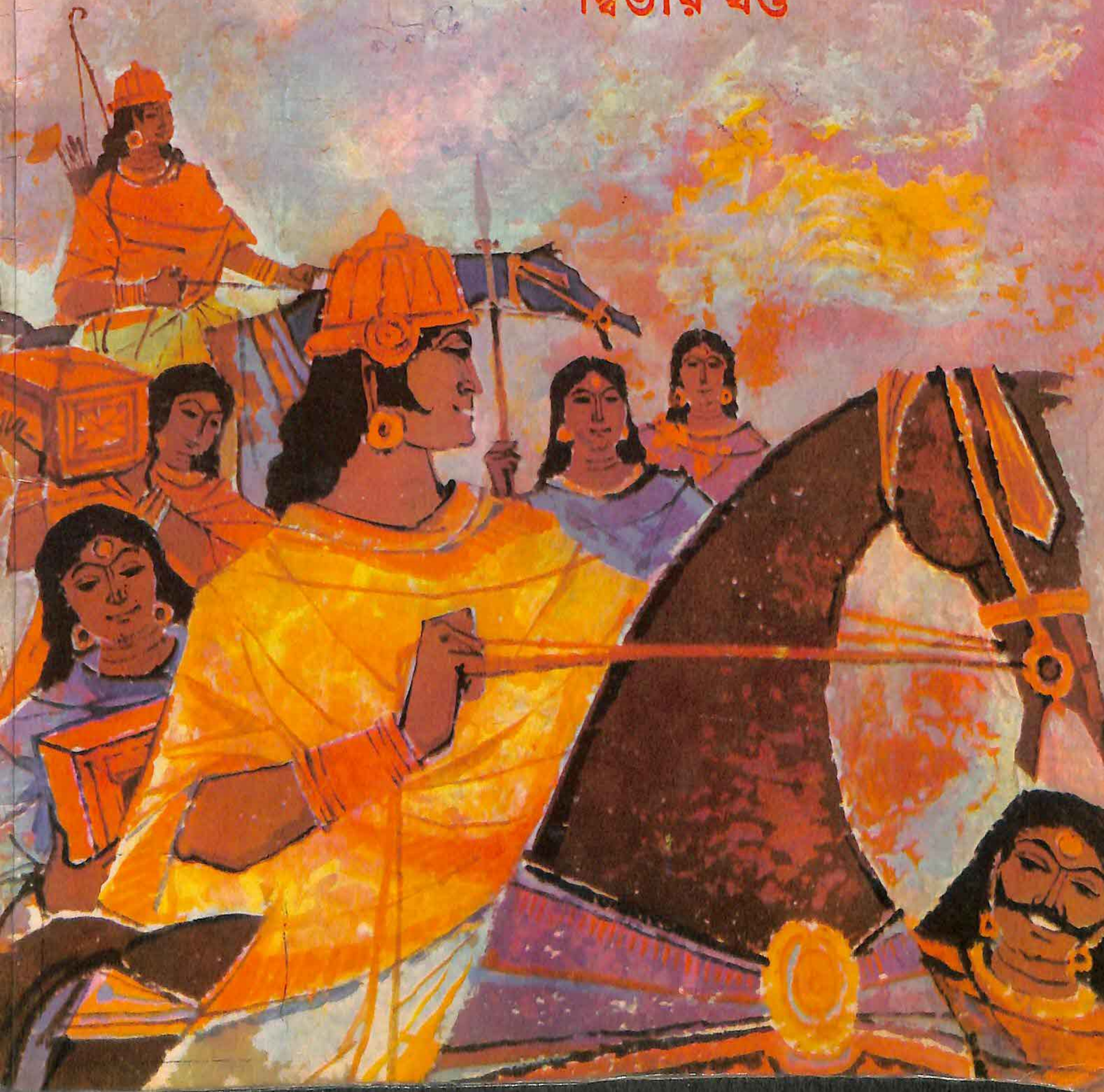
CHILDREN'S BOOK TRUST
NEW DELHI

পুরাণের গল্প

দ্বিতীয় খণ্ড



ISBN 81-7011-278-8



পুরাণের গল্প

দ্বিতীয় খণ্ড

ইংরাজীতে পুনর্লিখন—সাবিত্রী
অনুবাদ—প্রণতি চট্টোপাধ্যায়
চিত্রকার—পুলক বিশ্বাস

CHILDREN'S BOOK TRUST NEW DELHI

চিলড্রেন্স বুক ট্রাস্ট নূতন দিল্লী

Printed 1983
Reprinted 1987

PURANER GALPA
Dwitiya Khanda

ISBN 81-7011-278-8

Published by Children's Book Trust, Nehru House, 4 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi, and printed at the Trust's press, the Indraprastha Press, New Delhi.

ভূমিকা

ভারতীয় পুরাণ সংস্কৃত ভাষায় লেখা। এতে রয়েছে প্রাচীন ভারতের জীবন যাত্রা, চিন্তাধারা ও জ্ঞানের কথা। পুরাণের মধ্যে বেদ ও উপনিষদ্ প্রাচীনতম। আর রামায়ণ ও মহাভারত জনপ্রিয় পুরাণ। শেষোক্ত পৌরাণিক কাব্য দুটি প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তর জয় করেছে। এই দুই কাব্যে বর্ণিত মহান ব্যক্তি ও মহীয়সী নারীদের কথা বারবার পড়েও ক্লান্তি আসে না।

যদিও বর্ত্তমান জীবনধারা ও তখনকার জীবনধারার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে তথাপি জীবনের মূল সমস্যার আজও পরিবর্ত্তন হয়নি। পুরাণে মানুষের উদারতা, সত্যের জয়, অসত্যের পরাজয় বর্ণিত হয়েছে সে জন্য পুরাণের গল্প আমাদের এত প্রিয়।

এটি চিলড্রেন বুক ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত দ্বিতীয় খণ্ড। প্রথম খণ্ডের ন্যায় এটিও হিন্দি, বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।



ভস্মাসুর

ভস্মাসুর ছিল যেমন দুষ্ট প্রকৃতির তেমনি লোভী। একজন শক্তিশালী রাজা হতে চেয়েছিল, কিন্তু সাহস ও শক্তি এই দু'টিরই তার অভাব ছিল। সে জানত অন্য রাজাদের যুদ্ধে হারিয়ে শক্তিশালী হওয়া তার সাধ্যের বাইরে।

তাই, ভস্মাসুর কিছু অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করতে চাইল। তার মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্যে সে স্থির করল—সে শিবের তপস্যা করে তাঁর কাছ থেকেই অলৌকিক ক্ষমতা প্রার্থনা করবে।

নির্জনে তপস্যা করার জন্যে ভস্মাসুর ঘন বনের মধ্যে একটি বড় গাছ বেছে তার তলায় বসে শিবের তপস্যা আরম্ভ করল। এ ভাবে অনেকদিন কেটে গেল। অবশেষে একদিন শিবঠাকুর তার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ভস্মাসুরের সামনে

আবির্ভূত হয়ে বললেন, "আমি তোমার উপর খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার জন্য কি করতে হবে বল ?"

ভস্মাসুর বললে, "ঠাকুর আমি শুধু আপনার আশীর্বাদ প্রার্থী। এ ছাড়া আমার আর অন্য কোন কামনা নেই।"

এর উত্তরে শিবঠাকুর বললেন, "আমার আশীর্বাদ তো আছেই। তা হ'লেও আমার কাছ থেকে কোন বর পেলে তোমার নিশ্চয় ভাল লাগবে। তুমি যে বর চাইবে আমি তোমায় সে বরই দেব।"

"প্রভু, তা হলে আমায় এই শক্তি দান করুন যা পেলে আমি যার মাথায় আমার ডান হাত রাখব সে তখনি ভস্ম হয়ে যাবে।"—ভস্মাসুর এই প্রার্থনা শিবের কাছে নিবেদন করল।

'তথাস্তু'! "এখন থেকে তুমি যার মাথায় তোমার ডান হাত রাখবে সে তখনি ভস্ম হয়ে যাবে",—শিব বর দিলেন।

শিবের কাছ থেকে অলৌকিক ক্ষমতা পেয়ে ভস্মাসুর আনন্দে হেসে ফেলল।

"প্রভু, আপনি নিশ্চয়ই আমাকে এই ক্ষমতা পরীক্ষা করার সুযোগ দেবেন", এই বলে ভস্মাসুর লাফিয়ে উঠে শিবের মাথায় তার ডান হাত রাখতে

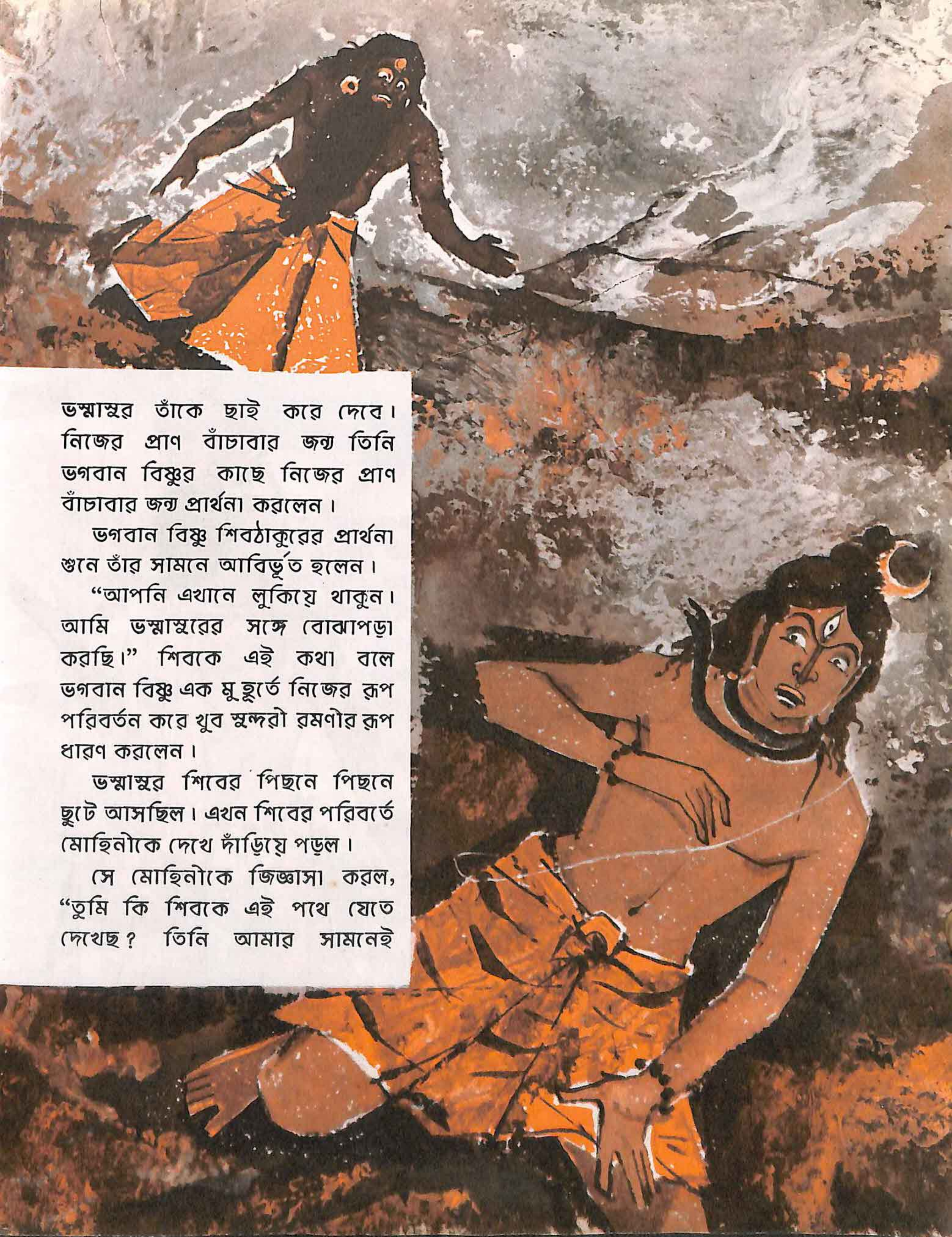


গেল। শিব বিপদে পড়লেন। শেষে ওর প্রাণ নিয়ে টানাটানি। তিনি জানতেন অসুরকে তাঁর মাথায় হাত দিতে দিলেই তিনি ভস্ম হয়ে যাবেন। শিবঠাকুর তখন প্রাণ বাঁচাবার জন্য দৌড় লাগালেন।

ভস্মাসুর শিবঠাকুরের পিছনে ছুটল। শিব পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে, নদী পেরিয়ে ঘন বন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে দৌড়তে লাগলেন। ভস্মাসুরও শিবের পিছনে ছুটে চলেছে। ভস্মাসুর ডান হাত তুলেই দৌড়াচ্ছে সুযোগ পেলেই শিবের মাথায় ডান হাত রাখবে।

শিবঠাকুর বুঝতে পারলেন তাঁর সাহায্যের দরকার। কারো সাহায্য না পেলে





ভস্মাসুর তাঁকে ছাই করে দেবে। নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য তিনি ভগবান বিষ্ণুর কাছে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য প্রার্থনা করলেন।

ভগবান বিষ্ণু শিবঠাকুরের প্রার্থনা শুনে তাঁর সামনে আবির্ভূত হলেন।

"আপনি এখানে লুকিয়ে থাকুন। আমি ভস্মাসুরের সঙ্গে বোঝাপড়া করছি।" শিবকে এই কথা বলে ভগবান বিষ্ণু এক মুহূর্তে নিজের রূপ পরিবর্তন করে খুব সুন্দরী রমণীর রূপ ধারণ করলেন।

ভস্মাসুর শিবের পিছনে পিছনে ছুটে আসছিল। এখন শিবের পরিবর্তে মোহিনীকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সে মোহিনীকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি শিবকে এই পথে যেতে দেখেছ? তিনি আমার সামনেই


ছিলেন কিন্তু হঠাৎ তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। শিব কোন পথে গেলেন বলতে পার ?

মোহিনী তার সুন্দর চোখ দু'টি তুলে ভস্মাসুরের দিকে তাকিয়ে দেখল।

মোহিনী তাকে বলল, "প্রভু! আপনাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আগে একটু বিশ্রাম করুন তারপর আবার শিবের পিছনে ছুটবেন। আপনি এখানে ঠাণ্ডা ছায়ায় বসুন। আমি আপনাকে হাওয়া করি ; আপনার ক্লান্তি দূর হবে।"

ভস্মাসুর মোহিনীকে দেখে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে মোহিনীকে





জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কে? তুমি এখানে কি করে এলে?" মোহিনী লজ্জিত ভাবে উত্তর দিল, "আমার নাম মোহিনী। আমি এই বনে আমার মা বাবার সঙ্গে থাকি। যারা এই পথে যায় আমরা সর্বদাই তাদের সাহায্য করি। আপনাকে ক্ষুধার্ত দেখাচ্ছে। আপনার জন্য কিছু ফল নিয়ে আসব কি?"

এই কথা শুনে ভস্মাসুর বলে উঠল, "না তুমি আমার কাছ থেকে চলে যেও না। তুমি কাছে থাকলেই আমার ক্ষুধা দূর হবে।" একটু থেমে সে আবার বললে, "মোহিনী, আমি তোমায় ভালবাসি। তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?" মোহিনী বললে, "আমি আপনাকে কি করে বিয়ে করব? খুব সম্ভবতঃ আপনি বিবাহিত ও আপনার অন্য পত্নীরা বর্ত্তমান।"

ভস্মাসুর তা'কে আশ্বাস দিল, "তোমার ধারণা ভুল। আমি অবিবাহিত। তুমি



আমায় বিয়ে করলে তুমিই আমার একমাত্র স্ত্রী হবে।"

মোহিনী হেসে উত্তর দিল, "পুরুষেরা সকলে এ কথাই বলে। আমি তাদের বিশ্বাস করি না।"

ভস্মাসুর এই শুনে বললে, "তুমি আমাকে ভুল বুঝছ। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি—তুমি আমাকে বিয়ে করলে আমি দ্বিতীয়বার বিয়ে করব না।"

মোহিনী বললে, "তা যদি ঠিক হয়, তবে আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে আপনি দ্বিতীয় বিবাহ করবেন না।"

"আমি শপথ করছি যে তুমি আমাকে বিয়ে করলে আমি দ্বিতীয় বিবাহ করব না", ভস্মাসুর এই বলে শপথ গ্রহণ করল।

মোহিনী তাকে বাধা দিয়ে বললে, "এ রকম শপথের কোন মূল্য নেই। আপনি ডান হাত দিয়ে নিজের মাথা স্পর্শ করে এই পবিত্র শপথ করুন, তাহ'লে আমি আপনার শপথে বিশ্বাস করব।"

ভস্মাসুর মোহিনীকে দেখে তার পাওয়া বরের কথা বিস্মৃত হয়েছিল।

সে মোহিনীর কথায় রাজী হ'ল। "আমি চাই তুমি আমায় বিশ্বাস করো। আমি তোমার ইচ্ছামত পবিত্র শপথ গ্রহণ করব।" এই ব'লে ভস্মাসুর দাঁড়িয়ে উঠে ডান হাত দিয়ে নিজের মাথা স্পর্শ করল। যে মুহূর্তে ভস্মাসুর নিজের মাথা স্পর্শ করল সে মুহূর্তে সে ভস্মে পরিণত হ'ল। এই ভাবে ভস্মাসুর শেষ হ'ল।

শিব তার লুকানো জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে মোহিনীকে দেখলেন। মোহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতঃ তাঁকে আলিঙ্গন করলেন।

মুহূর্তের মধ্যে মোহিনী অন্তর্দ্ধান করল আর সে জায়গায় ভগবান বিষ্ণু দাঁড়িয়ে শিবের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন।





বালি ও রাবণ

লঙ্কার রাজা রাবণ তখন তার মহিমার সর্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত। অনেক রাজাই তার সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গেছেন। সে খুব ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবন যাপন করত। রাবণ খুব জাঁকজমকে থাকলেও দেবরাজ ইন্দ্রের জাঁকজমক তার থেকে বেশী ছিল। এই জন্য রাবণ মনে মনে ইন্দ্রকে হিংসা করত এবং তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবার সুযোগ খুঁজছিল।

একদিন রাবণ তার পুত্র মেঘনাদকে ডেকে বললে, "মেঘনাদ, তুমি একজন বড় যোদ্ধা। তোমার যশ সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। তা সত্ত্বেও তুমি এখন আলস্যে সময় নষ্ট করছ। আর একবার সমস্ত বিশ্বের কাছে তোমার শক্তির পরিচয় দাও।"

এ কথা বলে রাবণ থামল না। সে আরও বললে, "তুমি জান আমি আমার সকল শত্রুকেই পরাজিত করেছি। বাকী আছে ইন্দ্র। যে আমাকে পছন্দ করে না। ওকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। চল ওর সঙ্গে যুদ্ধ করি। আমরা নিশ্চয়ই জিতব।"

মেঘনাদের এই পরামর্শ পচ্ছন্দ হল। ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সমস্ত আয়োজন করল। শীঘ্রই পিতাপুত্র বিরাট সৈন্যদল সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে লঙ্কা থেকে রওনা হল।

রাবণ ও মেঘনাদ ইন্দ্রের প্রাসাদের দ্বারদেশে পৌঁছে, ইন্দ্রকে বেরিয়ে এসে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার আহ্বান জানাল। ইন্দ্রের সে আহ্বানে সাড়া দেওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না।

ইন্দ্রের বিরাট সৈন্য বাহিনী ছিল। ঘোর যুদ্ধের শেষে ইন্দ্র ও তাঁর সৈন্য বাহিনী পরাজিত হল।

মেঘনাদ ইন্দ্রকে বন্দী করে লঙ্কায় নিয়ে গেল। রাবণ ও তার রাক্ষস সৈন্যরা ইন্দ্রের প্রাসাদ লুট করে বিজয় গর্বে রাজধানীতে ফিরে এল।

লঙ্কায় রাবণ, ইন্দ্রকে লোহার শিকল দিয়ে একটা থামের সঙ্গে বেঁধে রাখল। রাবণের প্রাসাদে সকলের কাছে ইন্দ্র ঠাট্টা ও বিদ্রূপের পাত্র হয়ে রইলেন।

বন্দীদশা থেকে ইন্দ্র পালাতে পারলেন না। তাঁকে অনেকদিন ওই অবস্থায় থাকতে হল। তখন তিনি অন্য দেবতার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

দেবতাদের পূজ্য ভগবান বিষ্ণু, ইন্দ্রের প্রার্থনা শুনলেন। ইন্দ্রকে সাহায্য করতে তিনি ব্রহ্মাকে অনুরোধ করলেন।

ব্রহ্মা লঙ্কায় গেলে রাবণ তাঁকে খুব আদর আপ্যায়ন করল। ব্রহ্মা রাবণকে



বললেন, “আমি শুনলাম তুমি ইন্দ্রকে বন্দী করে শিকল দিয়ে থামের সঙ্গে বেঁধে রেখেছ। তুমি বুঝতে পারছ না তুমি কি অন্যায় করছ। তোমার পক্ষে এরকম করা খুবই লজ্জাকর। এখনই ইন্দ্রকে মুক্ত করে তাঁর কাছে ক্ষমা চাও।

যে অল্প কয়েকজন দেবতাকে রাবণ শ্রদ্ধা করত ব্রহ্মা তাঁদের মধ্যে অন্যতম। রাবণ ব্রহ্মাকে অসন্তুষ্ট করতে চাইল না। ইন্দ্রকে তখনি মুক্তি দেওয়া হল। যুদ্ধ জয়ে আনন্দ উল্লাস করবার জন্য রাবণ লঙ্কায় খুব বড় উৎসবের অনুষ্ঠান করতে প্রজাদের আদেশ দিল। বিরাট ভোজ, নাচগান, বড় শোভাযাত্রা কিছুরই ত্রুটি রইল না। বিরাট সভা ডেকে ইন্দ্রকে জয় করার জন্য মেঘনাদকে “ইন্দ্রজিৎ” উপাধি দেওয়া হল।

যখন এই উৎসব সমারোহ চলছিল তখন নারদ লঙ্কায় আবির্ভূত হলেন। নারদকে



রাবণ খুব শ্রদ্ধা ভক্তি দেখাল। নারদ রাবণকে বললেন, "তোমার বিজয়ে তোমাকে অভিনন্দন জানাতে আমি এসেছি।"

রাবণ এ কথা শুনে প্রফুল্ল হয়ে উত্তর দিল, "আপনিও এ কথা শুনেছেন! সত্যি আমাদের খুব বিরাট জয় হয়েছে। ইন্দ্র আমাদের কাছে পরাজিত ও আমাদের হাতে বন্দী হয়েছিল। মেঘনাদ তাকে এখানে এনে বাঁদরের মত শিকল দিয়ে একটা থামের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল। আপনি যদি একটু আগে আসতেন তা'হলে ইন্দ্রকে থামে বাঁধা দেখতে পেতেন।" রাবণ একটু বিদ্রূপের সঙ্গে বললেন, "কিন্তু ব্রহ্মার, বেচারা ইন্দ্রের উপর দয়া হওয়ায় আমি তাকে বেশীদিন এখানে রাখতে পারলাম না। ব্রহ্মা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। ব্রহ্মা চোখে জল নিয়ে ইন্দ্রকে ছেড়ে দিতে আমায় অনুরোধ করলেন। আপনি জানেন ব্রহ্মা আমাকে খুবই শ্রদ্ধা করে, কাজেই





তার অনুরোধ আমি উপেক্ষা করতে পারলাম না। ইন্দ্রকে ছেড়েই দিলাম ”

নারদ বললেন, “একজনের সঙ্গে আমার পথে দেখা হল, সে বাদে জগতশুদ্ধ সবাই তোমার যশগান গাইছে।”

রাবণ গর্জন করে উঠল, “সে কে ?”

নারদ উত্তর দিলেন, “সে সামান্য একজন বানর। অবশ্য খুবই বড় বানর—বানররাজ বালি। সে যে সব কথা আমাকে বলেছে সে সব তোমাকে বলতে আমার ইচ্ছা নেই। সত্যি বলতে গেলে তোমাকে সে সব কথা বলতে আমার ভয় করছে।”

রাবণ খুব রেগে গেল। সে নারদকে বললে, “মুনি ঠাকুর, আপনি আমাকে সব কথা খুলে বলুন। ঐ বাঁদরটা আমার সম্বন্ধে কি বলেছে।”

নারদ একটু হেসে বললেন, “তুমি যদি জোর কর তবে অবশ্যই বলব। বানররাজ বালি মনে করে যে বীরত্বে তুমি তার সমকক্ষ নও। আর তুমি সে কথা জান বলেই তার সামনে যাও না। আমার মনে হয় এই বাঁদরটাকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। ওকে খোলা রাখা বিপদ-জনক। ওকে মেরে ওর হাড় গুঁড়িয়ে দেওয়া উচিত। ওকে শিকলে বেঁধে বাচ্চাদের খেলবার জন্যে এখানে আনলে তবে ওর উচিত শিক্ষা হয়।”

এই কথা শুনে রাবণ ভীষণ রেগে তার ছেলেকে সৈন্যদের নিয়ে প্রস্তুত হতে আদেশ দিল।

নারদ হেসে বললেন, “তোমার পক্ষে একটা বানরের সঙ্গে সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করতে যাওয়া লজ্জার বিষয়। সারা পৃথিবীর লোক তোমায় দেখে হাসবে যদি তুমি সৈন্য নিয়ে একটা বানরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাও। এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে তুমি তোমার শক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ। একটা বানরকে সায়েস্তা করতে সৈন্যসামন্ত অস্ত্রশস্ত্র

এসব কিছুরই দরকার হবে না। তুমি একেলাই ওকে সায়েস্তা করতে পারবে। তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারি।"

রাবণ অল্প সময় চিন্তা করে নারদের সঙ্গে যেতে রাজী হল। ওরা দু'জনে তখনি বালির বাসস্থানের উদ্দেশে রওনা হলেন।

সেখানে পৌঁছে নারদ বললেন, "ঐ দেখ,—বালি।" রাবণ জিজ্ঞাসা করল, "কোথায়? আমি তো শুধু একটা পাহাড় দেখতে পাচ্ছি। সে কি ঐ পাহাড়ের পিছনে আছে?"

নারদ উত্তর দিলেন, "না, না, ওটা মোটেই পাহাড় নয়। ঐ হচ্ছে বালি। মনে নেই আমি তোমায় বলেছিলাম যে বালি মস্ত বড় বানর। ওকে দেখে ভয় পেয়ো না। ও একটা বানর বৈ ত নয়, তোমাকে দেখলেই ও লাফ দিয়ে কোন একটা উঁচু গাছে চড়ে বসবে। তুমি ওকে তার আগেই ধরে ফেল। ঐ ত পিছনে ওর ল্যাজ দেখা যাচ্ছে। ওর ল্যাজ ধরে ওকে জব্দ করার চেষ্টা কর, তা'হলে ও আর পালাতে পারবে না।"

রাবণ বালির মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত খুঁটিয়ে দেখল। বালি এত বড় বানর ছিল যে রাবণ ভয় পেয়ে গেল।



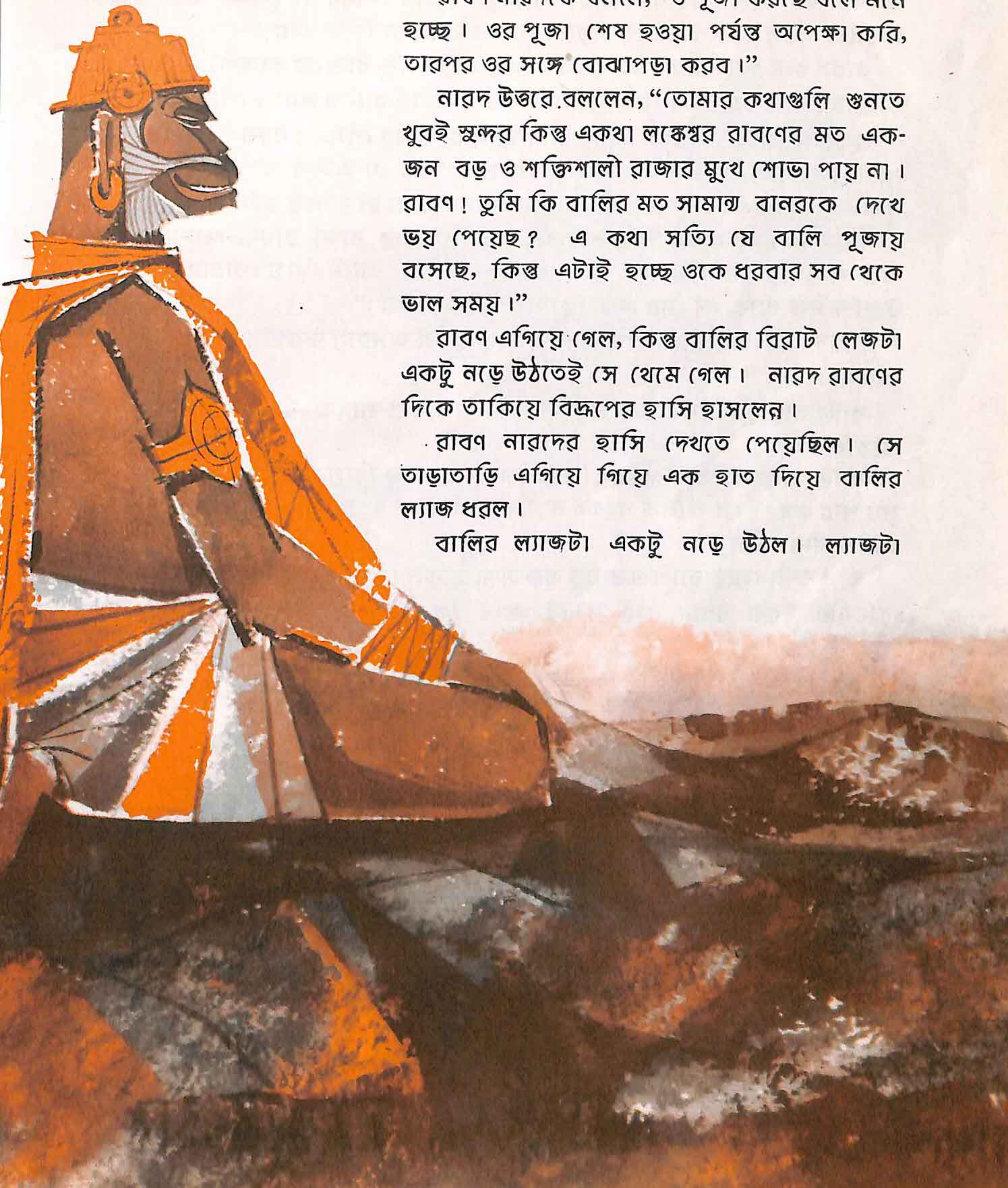
রাবণ নারদকে বললে, "ও পূজা করছে বলে মনে হচ্ছে। ওর পূজা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি, তারপর ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করব।"

নারদ উত্তরে বললেন, "তোমার কথাগুলি শুনতে খুবই সুন্দর কিন্তু একথা লঙ্কেশ্বর রাবণের মত এক-জন বড় ও শক্তিশালী রাজার মুখে শোভা পায় না। রাবণ! তুমি কি বালির মত সামান্য বানরকে দেখে ভয় পেয়েছ? এ কথা সত্যি যে বালি পূজায় বসেছে, কিন্তু এটাই হচ্ছে ওকে ধরবার সব থেকে ভাল সময়।"

রাবণ এগিয়ে গেল, কিন্তু বালির বিরাট লেজটা একটু নড়ে উঠতেই সে থেমে গেল। নারদ রাবণের দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসলেন।

রাবণ নারদের হাসি দেখতে পেয়েছিল। সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে এক হাত দিয়ে বালির ল্যাজ ধরল।

বালির ল্যাজটা একটু নড়ে উঠল। ল্যাজটা



ফাঁসের মত হয়ে রাবণের হাত পেঁচিয়ে ধরল। রাবণ কিছুতেই তার হাতটা ছাড়াতে পারল না। সে তখন পরামর্শের জন্য নারদের দিকে তাকাল।

নারদ বললেন, "রাবণ অন্য হাতটা দিয়ে তাড়াতাড়ি বানরের ল্যাজটা ধরে টান।"

রাবণ সে রকম ভাবে চেষ্টা করতেই অন্য হাতটাও বালির ল্যাজে পেঁচিয়ে গেল।

মুহূর্তের মধ্যে বালির ল্যাজ রাবণের সারা শরীর পেঁচিয়ে ধরল। রাবণ বুঝতে পারল যে সে বালির ল্যাজে আটকা পড়েছে। এতে সে অত্যন্ত অসহায় বোধ করতে লাগল। রাবণ একটা বস্তার মত বালির ল্যাজে বাঁধা হয়ে পড়ে রইল।

নারদ রাবণের কাছে গিয়ে বললেন, "হে, শক্তিধর রাজা রাবণ, আমাকে এখন অন্য জায়গায় যেতে হবে। তুমি ব্যস্ত হয়ো না। আমি গিয়ে তোমার বীর ছেলে ইন্দ্রজিতকে বলব, সে যেন এসে তোমায় সাহায্য করে।"

নারদ এই কথাগুলি বলে, রাবণকে ঐ রকম অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গেলেন।

বালি তার পূজা শেষ করে উঠে দাঁড়াল। সে তার ল্যাজে বাঁধা রাবণকে লক্ষ্যই করেনি।

বালি তারপর তীর্থ যাত্রায় বার হল। সে লাফ দিয়ে পাহাড়, সাগর, মহাসাগর সব পার হল। সে অনেক পবিত্র নদীতে স্নান করল। রাবণ কিন্তু সব সময়েই তার ল্যাজে বাঁধা ছিল।

তীর্থ দর্শন সেরে বালি মস্ত বড় এক সভা ডাকল। বালিকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য পৃথিবীর সকল বানর সেই সভায় এল। সে সভায় একজন খেয়াল করল বালির





ল্যাজে কি একটা অদ্ভুত জিনিষ আছে। তারা জিনিষটার চারপাশে ঘিরে ভাল করে দেখতে গেল। তারা দেখল মস্ত বড় একটা মানুষ বালির ল্যাজে বাঁধা আছে।

বানরেরা এতে মজা পেয়ে রাবণকে ক্ষেপাতে লাগল।

ব্যাপারটা কি দেখতে পিছন ফিরতেই বালি তার ল্যাজে বাঁধা রাবণকে দেখতে পেল। বালি তখনি রাবণকে ছেড়ে দিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল,—"সে কি ভাবে তার ল্যাজে বাঁধা পড়েছে আর কতক্ষণ ধরে সে এইভাবে আছে?"

রাবণকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে সে অত্যন্ত দুঃখিত। সে মাথা নীচু করে বালিকে সব কথা খুলে বললে। রাবণ আরো বললে যে সে তার সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছিল বলে সে দুঃখিত।

বালি রাবণকে সহানুভূতি দেখিয়ে বললে যে রাবণকে এত কষ্ট পেতে হয়েছে বলে সেও দুঃখিত। বালি রাবণকে লঙ্কায় ফিরে যেতে অনুরোধ করল।

"রাবণ তুমি আমার উপর বিরূপ মনোভাব রেখ না, আর দেবতা অথবা মানুষ কাউকে হিংসা কর না।" এই বলে বালি রাবণকে বিদায় দিল।

রাবণ দুঃখিত ও লজ্জিত হয়ে নিজের প্রাসাদে ফিরে গেলেও এই অভিজ্ঞতার ফলে তার জ্ঞানবৃদ্ধি হল।







কালীয়নাগ

কৃষ্ণ ছিল পৃথিবীর সব চেয়ে মনোরম শিশু। দেখতে কাল হলেও তার মত সুন্দর শিশু আর ছিল না। সে সুন্দর সুন্দর পোষাক ও গহনা পরে থাকত। মাথার চুল চূড়া করে বাঁধা থাকত, আর তাতে সর্বদা একটা ময়ূরের পালক থাকত। বালক কৃষ্ণ ছিল সকলের আদরের ধন।

কৃষ্ণের ছেলেবেলা নানা রকম আমোদ প্রমোদে ভরা। তার অনেক বন্ধু ছিল। সে সারা গ্রামে ঘুরে তার বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করত। সে ছিল দলের নেতা। সে তার সঙ্গীদের অনেক সাহসের কাজ করতে উৎসাহ দিত। কৃষ্ণ লোককে বোকা বানাতে ও তাদের নিয়ে মজা করতে পছন্দ করত। এ জন্য তার মা বাবা কখনো কখনো তার উপর বিরক্ত হতেন। লোকদের নিয়ে মজা করলেও সকলেই কিন্তু তাকে ভালবাসত।

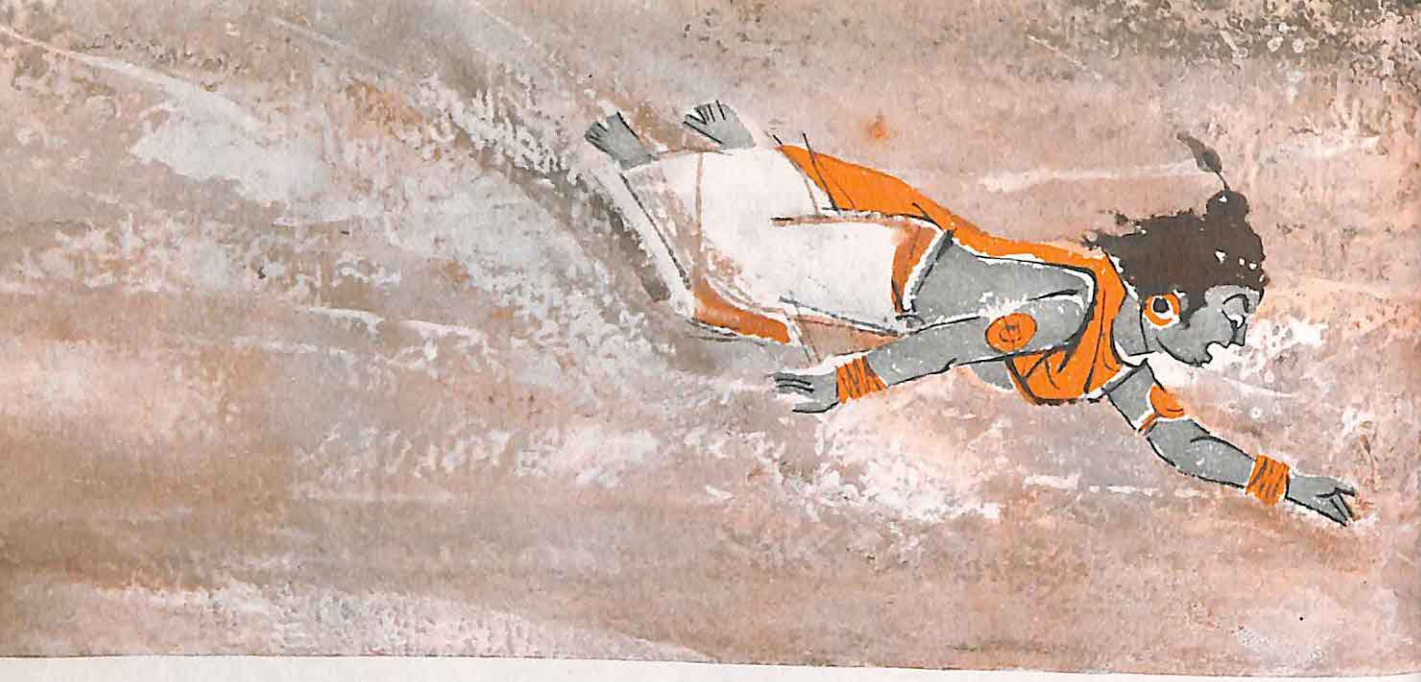
একটু বড় হয়ে কৃষ্ণ রাখালের কাজ করত। গরু বাছুরদের আর তাদের চরবার সবুজ মাঠগুলি, এ সবই তার ভাল লাগত। সব রাখাল বালকেরাই ছিল তার বন্ধু। রোজ সকালে তারা একসঙ্গে বনে গরু চরাতে যেত আবার সন্ধ্যার সময় এক সঙ্গে বাড়ী ফিরত।

বনে গরুদের জন্য প্রচুর ঘাস ও জল পাওয়া যেত। কৃষ্ণ আর তার বন্ধুদের খেলা ও মজা করবার জন্যে বনটা ছিল ভাল জায়গা।

কৃষ্ণ সঙ্গীতপ্রিয় ছিল। সে খুব ভাল বাঁশি বাজাতে পারত। তার বাঁশি শুনে সকলেই আনন্দ পেত। বনে গিয়ে কৃষ্ণ গাছের ডাল বা একটা বড় পাথরের উপর বসে বাঁশি বাজাত। রাখাল-বালকেরা ঘাসের উপর বসে তার বাঁশি শুনত। গরু বাছুরেরাও ঘাস খাওয়া বন্ধ করে কৃষ্ণের কাছে গিয়ে তার বাঁশি শুনত। বনের হিংস্র পশুরাও কৃষ্ণের বাঁশি শুনে পোষ মেনে যেত।

বাড়ীতেও কৃষ্ণের বাঁশি লোককে আকৃষ্ট করত। কৃষ্ণ যখন বাঁশি বাজাত, সব পুরুষ, স্ত্রীলোক ও





ছোট ছোট ছেলেরা যে যার নিজের নিজের কাজ ফেলে তার কাছে ছুটে যেত। কৃষ্ণকে সকলেই ভালবাসত।

একবার কালীয় নামে মস্তবড় একটা সাপ যমুনার জলে এল। এই যমুনা নদীর জলই গরুরা ও রাখাল বালকেরা পান করত।

কালীয় ছিল খুব বিষাক্ত সাপ। নদীর জলও তাই শীঘ্র বিষাক্ত হয়ে গেল। যে যমুনার জল পান করত সে মরে যেত। বিষের জন্য যমুনার সমস্ত মাছ মরে ভেসে উঠল। কুমীরেরা বিষাক্ত জল ছেড়ে তীরে উঠে এল। তীরে উঠে তারা অন্য পশুদের আক্রমণ ও শস্যের ক্ষতি করতে লাগল। এমন কি বিষের প্রভাবে নদীতীরের গাছগুলি শুকিয়ে যেতে লাগল। কালীয়নাগ সকলের মারাত্মক শত্রু হয়ে উঠল।

কৃষ্ণ এই বিষাক্ত কালীয়নাগের কথা শুনল। সকলেই কালীয়নাগের নামে নালিশ করতে লাগল। কিন্তু ভয়ে কেউ কিছু করতে পারল না। ছোট হলেও কৃষ্ণ দুর্বৃত্ত কালীয়নাগকে তার দুষ্ট কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া ঠিক করল।

একদিন কৃষ্ণ একাই বিরাট কালীয়নাগের খোঁজে যমুনায় গেল। সেখানে গিয়ে কৃষ্ণ দেখল যে, সব থেকে গভীর জলের নীচে কালীয়নাগের বাসা। কৃষ্ণ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে কালীয়নাগের বাসায় গেল।

একটা কালো ছেলেকে তার শান্তি ভঙ্গ করতে আসতে দেখে কালীয় খুব রেগে গেল। সে কৃষ্ণকে এক ঝাপটায় মেরে ফেলবে বলে তেড়ে গেল। কৃষ্ণ তাড়াতাড়ি জলের উপর ভেসে উঠল। কালীয়নাগও সঙ্গে সঙ্গে এল।

কৃষ্ণ তাকে কামড়াবার কোন সুযোগই দিল না। তড়িৎ গতিতে কৃষ্ণ তার মাথা ধরে কালীয়নাগের বিরাট ফণার উপরে দাঁড়িয়ে পড়ল।





কালীয় কৃষ্ণকে তার ফণার উপর থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। তখন কালীয়নাগ কৃষ্ণকে ল্যাজ দিয়ে পেঁচিয়ে মেরে ফেলবার চেষ্টা করল। কিন্তু দেখা গেল কৃষ্ণ সাপের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিধর।

কালীয় তখন কৃষ্ণকে ডুবিয়ে মারতে গভীর জলে ডুব দিল। যতক্ষণ খুসী নিঃশ্বাস না নিয়ে কৃষ্ণ জলের নীচে থাকতে পারত। শেষে কালীয়কেই নিঃশ্বাস নেবার জন্যে জলের উপরে উঠে আসতে হল।

কালীয়নাগ খুবই রেগে গিয়েছিল কিন্তু সে কিছু করতে পারছিল না। কৃষ্ণ তার ফণার উপর চড়ে লাফাতে আর লাথি মারতে লাগল। কালীয় কৃষ্ণকে মাথা থেকে ফেলে দেবার অনেক চেষ্টা করল কিন্তু পারল না।

কৃষ্ণ দু'হাতে তার মাথার দু'দিক চেপে ধরে যত জোরে পারল তার মাথায় লাথি মারতে লাগল।

যমুনার তীরে দাঁড়িয়ে অনেক লোক এই লড়াই দেখছিল। এ দৃশ্য দেখে তাদের ভয় করছিল কিন্তু কৃষ্ণকে দেখে মনে হচ্ছিল সে আনন্দে বিষধর কালীয়নাগের মাথার উপর নাচছে।

ধীরে ধীরে কালীয়নাগের শক্তি কমে এল। সে আর কৃষ্ণের আক্রমণের জোর সহ্য করতে পারছিল না।

শেষে কালীয়নাগ বিষ বমি করতে আরম্ভ করল। যতক্ষণ না তার সমস্ত বিষ উঠে এল ততক্ষণ কৃষ্ণ তাকে লাথি মারা থামাল না।

কালীয়নাগ বুঝতে পারল যে কৃষ্ণের দয়াভিক্ষা করা ছাড়া তার আর বাঁচবার অন্য কোন উপায় নেই। এই ভেবে কালীয়নাগ লড়াই করা ছেড়ে দিল।

কালীয়নাগ কৃষ্ণের কাছে তার প্রাণ ভিক্ষা করল। সে প্রতিশ্রুতি দিল তাকে প্রাণে না মারলে সে কৃষ্ণ যা বলবে তাই সে শুনবে।

কৃষ্ণ তার প্রার্থনা শুনল। সে কালীয়নাগকে মুক্তি দিল। শেষে তাকে আদেশ করল যে, সে যেন বহুদূরে চলে যায় ও যমুনায় আর না আসে।

কালীয়নাগ কৃষ্ণকে প্রণাম করে নিঃশব্দে যমুনা ছেড়ে চলে গেল।

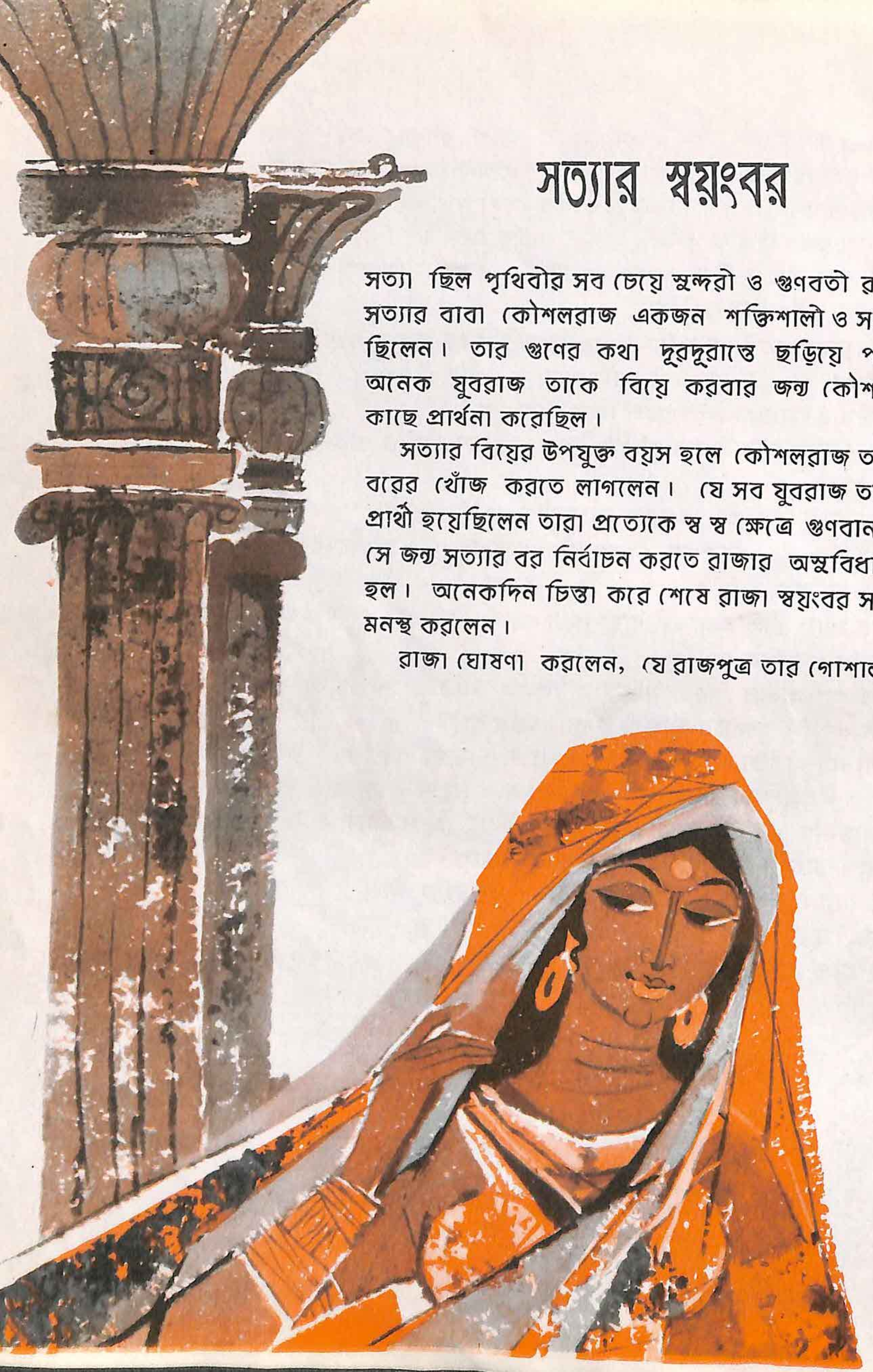
কৃষ্ণ সাঁতরে তীরে ফিরে আসতেই লোকেরা তার জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল।

সত্যার স্বয়ংবর

সত্যা ছিল পৃথিবীর সব চেয়ে সুন্দরী ও গুণবতী রাজকন্যা। সত্যার বাবা কৌশলরাজ একজন শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ রাজা ছিলেন। তার গুণের কথা দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। অনেক যুবরাজ তাকে বিয়ে করবার জন্য কৌশলরাজের কাছে প্রার্থনা করেছিল।

সত্যার বিয়ের উপযুক্ত বয়স হলে কৌশলরাজ তার যোগ্য বরের খোঁজ করতে লাগলেন। যে সব যুবরাজ তার পাণি-প্রার্থী হয়েছিলেন তারা প্রত্যেকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে গুণবান ছিলেন, সে জন্য সত্যার বর নির্বাচন করতে রাজার অসুবিধায় পড়তে হল। অনেকদিন চিন্তা করে শেষে রাজা স্বয়ংবর সভা ডাকা মনস্থ করলেন।

রাজা ঘোষণা করলেন, যে রাজপুত্র তার গোশালায় বন্দী



সাতটি বুনো ষাঁড়কে জোয়ালে জুততে পারবে, তার সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দেবেন।

স্বয়ংবর সভার দিন স্থির করা হল। যাদের সত্যার বর হবার যোগ্য মনে করলেন, সে সব রাজা ও রাজপুত্রদের নিমন্ত্রণ পাঠালেন,—তারা যেন সভায় এসে নিজের শক্তির পরীক্ষা দিয়ে ভাগ্য যাচাই করেন। রাজা ধূমধামের সঙ্গে সত্যার বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

রাজ অতিথিদের জন্য নতুন প্রাসাদ তৈরী করালেন। তাতে বিরাট ভোজ দেবার উপযুক্ত বড় বড় রান্নাঘর, খাবার ঘর তৈরী হল।

অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য বিখ্যাত নর্তকী ও গায়কদের আনা হল। সমস্ত শহর সাজিয়ে আলোকিত করা হল।

অতিথিরা একে একে আসতে লাগলেন। প্রত্যেক রাজা ও রাজপুত্রই মনে মনে আশা করছিলেন যে তিনি পণে জিতে সত্যাকে বিয়ে করবেন। প্রত্যেকে, হাতি ঘোড়া, রথ পাল্কী ও সৈন্য নিয়ে বড় বড় শোভাযাত্রা করে আসতে লাগলেন। তাছাড়া সকলেই তাঁদের সঙ্গে মন্ত্রী ও সভাসদ্দের এনেছিলেন। হীরা জহরত ও পোষাকে ভর্ত্তি বাক্স বয়ে অনেক চাকরও তাঁদের সঙ্গে এসেছিল।

প্রত্যেক অতিথিকে যথোচিত সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা করা হল।





তাঁদের সুন্দর সুন্দর প্রাসাদে থাকার ব্যবস্থা করা হ'ল ও সেই সঙ্গে চমৎকার খাওয়া দাওয়া ও আমোদ প্রমোদের সুব্যবস্থা করা হল।

স্বয়ংবরের দিন রাজ-অতিথিরা তাঁদের সবচেয়ে ভাল পোষাক ও হীরা জহরতের গহনা পরে সভার দিকে রওনা হলেন। চারদিক ঘেরা একটা বড় ময়দানের একদিকে তাঁরা জমায়েৎ হলেন। কৌশলরাজ তাঁর পরিবারের লোকজন, মন্ত্রী, সভাসদ্ ও মিত্রদের নিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি সর্বসমক্ষে ঘোষণা করলেন যে রাজপুত্র প্রথমে একটি জোয়ালে সাতটি বুনো ষাঁড়কে জুততে পারবে তাকেই সত্যা বিয়ে করবে। তারপর প্রতিযোগিতা সুরু করবার আদেশ দিলেন।

ঢাক ঢোল, কাড়ানাকাড়া, তুরী ভেরী বাজিয়ে প্রতিযোগিতা সুরু হল। বাদ্যযন্ত্রের সুর খুবই উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল।

এইবার সেই মাঠে সাতটা বড় বড় পিঁজরা আনা হল। ভৃত্যেরা পিঁজরার দরজা খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সাতটা বিরাট বিরাট ও দেখতে ভয়ঙ্কর ষাঁড় বেরিয়ে এল। মাঠের চারপাশে এমনভাবে তারা ঘুরে বেড়াতে লাগল যেন সকলকে তারা যুদ্ধে আহ্বান করছে।

প্রত্যেক প্রতিযোগীরই ইচ্ছা, প্রথমে সেই ভাগ্য পরীক্ষা করে, কারণ প্রত্যেকেই সত্যাকে বিয়ে করতে চায়। ফলে অনেকে একসঙ্গে বুনো ষাঁড়দের জোয়ালে জুতবার আশায় বেড়ার ভিতরে ঢুকে পড়লেন।

একজন রাজা নিজেকে অন্য প্রতিযোগীদের তুলনায় বেশী শক্তিমান মনে করতেন,





কেন না তিনি অনেক যুদ্ধ জয় করেছিলেন। তিনি খুব সাহসের সঙ্গে একটা ষাঁড়ের দিকে এগোতেই, ষাঁড়টা তীব্র বেগে তেড়ে এসে তাকে শিঙের উপর ঘুরিয়ে মাটিতে আছড়ে ফেলে দিল। ষাঁড়টা আবার তেড়ে আসতেই তিনি প্রাণভয়ে উঠে দৌড়তে লাগলেন। আর একজন রাজকুমার অনেক বন্যপশু শিকার করেছিলেন। তিনি একটা ষাঁড়ের দিকে এগিয়ে যেতেই ষাঁড়টা তাঁকে গুঁতিয়ে রক্তাক্ত করে দিল। রাজপুত্র অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। আর এক রাজপুত্র একটা ষাঁড়ের দিকে এগিয়েছিলেন কিন্তু ভয় পেয়ে দৌড়ে মাঠের বাহিরে চলে গেলেন। অন্য এক রাজপুত্র একটা ষাঁড়কে ধরবার চেষ্টা করতেই ষাঁড়টা লাথি মেরে ওঁর পা ভেঙ্গে দিল।

একজন রাজা একটা ষাঁড়ের ল্যাজ ধরতেই ষাঁড়টা মাঠময় ছুটোছুটি করতে লাগল, রাজাও অগত্যা তার ল্যাজ ধরে ঝুলতে থাকলেন। এই দৃশ্য দেখে কেউ হাসি চাপতে পারল না। আর এক রাজপুত্র একটা ষাঁড়ের শিঙ্ ধরবার চেষ্টা করতেই ষাঁড়টা ওকে শূন্যে ছুঁড়ে ফেলল। কয়েকটা ষাঁড় একজন রাজাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে আহত করল। এভাবে রাজাদের মধ্যে কারো চোখ কানা হল কারো বা হাত ভাঙ্গল। প্রত্যেক রাজাই ষাঁড়গুলোকে এক জোয়ালে জুতবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কেউই সফল হতে পারেন নি।

এর ফলে সকলেই নিরাশ হয়ে পড়লেন। কয়েকজন রাজপুত্র একথাও বললেন যে কৌশলরাজ তাঁদের অসাধ্য সাধন করতে বলছেন। কাজেই কৌশলরাজের উচিৎ তাদের মধ্যে থেকে একজনকে বেছে তার সাথে সত্যার বিয়ে দেওয়া। সত্যার বিয়ের বন্দোবস্ত যখন হয়ে গেছে তখন তার বিয়ে এভাবে দেওয়াই উচিত।





প্রতিযোগিরা সবাই বিফল হওয়ায় কোশলরাজও খুবই দুঃখিত হলেন এবং ষাঁড়গুলোকে পিঁজরার মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার আদেশ দিলেন।

এমন সময় হঠাৎ রথে চড়ে কৃষ্ণ প্রতিযোগিতায় ভাগ নেবার জন্যে উপস্থিত হলেন। অর্জুন কৃষ্ণের সারথি হয়ে এসেছিলেন। প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে সত্যাকে বিয়ে করার ইচ্ছা ছিল কৃষ্ণের।

কোশলরাজ কৃষ্ণকে স্বাগত জানিয়ে প্রতিযোগিতার শর্ত বললেন। কৃষ্ণ সে শর্ত মেনে নিয়ে মাঠে প্রবেশ করলেন। বিফল মনোরথ রাজা ও রাজপুত্ররা কৃষ্ণ কি করেন দেখতে লাগলেন।

সাতটি বুনো ষাঁড়ই মাথা উঁচু করে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল। মনে হচ্ছিল তারা যেন নিজেদের বিজয় উৎসব করছে। এমন সময় তারা দেখল আর একজন মানুষ খুব সাহসের সঙ্গে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তারা তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল আর কৃষ্ণও তাদের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। এই প্রথম ষাঁড়গুলো ভয় পেল। কৃষ্ণ ছিলেন যেমন বলবান তেমন বুদ্ধিমান। তিনি বন্য পশুদের পোষ মানাবার কায়দা জানতেন। তিনি ধীরে ধীরে ষাঁড়গুলোর চারপাশে ঘুরে এক এক

করে ওদের ধরে সব কটাকে জোয়ালে জুতে দিলেন।

রাজা ও রাজপুত্রেরা তা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। সবাই কৃষ্ণের জয়ধ্বনি দিতে লাগল। বাজনদারেরা জোরে জোরে ঢাক ঢোল, তুরী ভেরী বাজাতে শুরু করে দিল। কোশলরাজ কৃষ্ণকে অভিনন্দন করে সত্যাকে তাঁর হাতে সঁপে দিলেন। সবাই আনন্দ উল্লাস করতে লাগল।



এ দেখে অকৃতকার্য রাজা ও রাজপুত্ররা গণ্ডগোল বাধালেন। কৃষ্ণ প্রতিযোগিতায় জিতে সত্যাকে লাভ করায় তাঁদের অসহ্য লাগল। তাঁরা রেগে, দাঁড়িয়ে উঠে চীৎকার করে বলতে লাগলেন, "কে এই কৃষ্ণ? এ তো একটা রাখাল! এ তো নিজের মামাকে বধ করেছে! কি করে আমরা উচ্চবংশজাত এতগুলি রাজা ও রাজপুত্র আর এক উচ্চবংশজাত রাজকন্যার সঙ্গে একজন নগণ্য গো-পালকের বিবাহে সম্মত হই?"

তাঁরা ক্রমাগত এ কথাই চীৎকার করে বলতে লাগলেন। শেষে তাঁরা জানিয়ে দিলেন তাদের সামনে এক গো-পালক



রাজকুমারীকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে এতে তাঁদের মর্যাদা হানি হয়। তাঁরা কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করে এ প্রশ্নের মীমাংসা করবেন।

কৃষ্ণ ও অর্জুন সত্যাকে নিয়ে স্বয়ংবর সভা ত্যাগ করে যাবার মুহূর্তে এই যুদ্ধের আহ্বান এল। কৃষ্ণ তাতে ভ্রূক্ষেপ না করে রথে চড়ে বসলেন ও সত্যাকে তাঁর পাশে বসালেন। যে সব রাজা ও রাজপুত্র তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায়, তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে অর্জুনকে পাঠালেন।

অর্জুন তাদের কাছে গিয়ে শান্ত হবার জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি তাঁদের বুঝিয়ে বললেন, যে কৃষ্ণ সর্বসমক্ষে সৎ উপায়ে প্রতিযোগিতায় জিতে রাজকুমারী







সত্যাকে লাভ করেছেন। তিনি আবার তাঁদের অনুরোধ করলেন তাঁরা যেন অহেতুক গোলযোগের সৃষ্টি না করেন। কিন্তু সে সব রাজন্যবর্গ অকৃতকার্য হওয়ার ক্ষোভে ও ক্রোধে, অর্জুনের কথায় কর্ণপাত করলেন না। তাঁরা কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইলেন।

"তা হলে তৈরী হও," এই বলে অর্জুন তাঁর প্রচণ্ড শক্তিশালী ধনুর্বাণ গাণ্ডিব দিয়ে শত্রুদের উপর প্রবল বৃষ্টির মত তীর বর্ষণ করতে লাগলেন। রাজা ও রাজপুত্ররাও পাল্টা তীর ছুঁড়তে লাগলেন কিন্তু তা অর্জুনের বাণের তুলনায় কিছুই নয়।

অর্জুন এমন ভাবে তীর ছুঁড়ছিলেন যাতে কেউ নিহত না হন। তাঁর তীর শুধু শত্রুদের তীর ও ধনুক সব ভেঙ্গে দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁদের হাতে যুদ্ধ করবার মত অস্ত্র রইল না। কিন্তু তাঁরা তবু ক্ষান্ত হলেন না, তাঁরা যুদ্ধ চালাবার চেষ্টা করছিলেন। তাতে অর্জুন এমন শর মারলেন যে তাঁদের পোষাক সব নষ্ট হয়ে গেল, আর রাজা ও রাজপুত্ররা সবার সামনে যুদ্ধক্ষেত্রে বিবস্ত্র হয়ে পড়লেন।

লজ্জায় সে সব রাজা ও রাজপুত্ররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেলেন।

রাজা কৌশলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কৃষ্ণ সত্যাকে পাশে বসিয়ে, যাত্রা করলেন। অর্জুন সারথি হয়ে রথ চালালেন।



স্যমন্তক মণি

সত্রাজিৎ একজন সাধুপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি ছিলেন সূর্যদেবের ভক্ত এবং অনেকদিন ধরে সূর্যদেবের উপাসনা করছিলেন। তাঁর ভক্তিতে প্রসন্ন হয়ে সূর্যদেব তাঁকে দেখা দিয়ে বর প্রার্থনা করতে বললেন।

সত্রাজিৎ গরীব ছিলেন। তাঁর ধনী হবার বাসনা ছিল। তিনি সূর্যদেবের কাছে প্রার্থনা করলেন যে তাঁর যেন অনেক ধন দৌলত হয়।

সূর্যদেব সত্রাজিতের প্রার্থনা পূর্ণ করলেন। তিনি তাঁকে স্যমন্তক নামে একটি বহুমূল্য মণি দিয়ে বললেন, "এই মণি থেকে রোজ অনেকখানি সোনা উৎপন্ন হবে। এটিকে সাবধানে রেখ।"

স্যমন্তক মণি ঠিক সূর্যের মত উজ্জ্বল। সত্রাজিৎ মণিটিকে বাড়ী নিয়ে গেলেন। যারা সে মণিটি দেখল, তারা ভাবল স্যমন্তক মণি-ই হচ্ছে স্বয়ং সূর্যদেব। তারা ভয় পেল যে সূর্যদেব পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবার ফলে অমঙ্গল ঘটবে। তারা কৃষ্ণের কাছে পরামর্শ করতে গেল।

কৃষ্ণ তাদের সঙ্গে কথা বলে তাদের ভয় দূর করবার চেষ্টা করলেন। কৃষ্ণ বললেন, "স্যমন্তক একটি উজ্জ্বল ও অমূল্য মণি, তাই সূর্যের মত দেখাচ্ছে। এতে ভয়ের কি আছে? আর সত্রাজিৎ আমাকে দেখাবার জন্যে ঐ মণি আমার কাছে নিয়ে আসছে।"

সত্রাজিৎ কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করলেন ও সূর্যদেবের দেওয়া আশ্চর্য মণিটি তাঁকে দেখালেন।

কৃষ্ণ সত্রাজিৎকে বললেন, "এটি একটি পরমাশ্চর্য মণি ও সূর্যের মত উজ্জ্বল। মণিটি থেকে রোজই সোনা উৎপন্ন হবে। লোকেরা ক্রমে এই সোনার কথা জানতে পারবে। তুমি দস্যুদের থেকে সাবধান হবে।"

কৃষ্ণ আরো বললেন, "মণিটি তোমার কাছে রাখা বিপদজনক মনে হচ্ছে। তুমি ইচ্ছা করলে আমার কাছে মণিটি রেখে যেতে পার। আমি মণিটিকে সাবধানে রাখব। তুমি রোজ এখানে এসে যা সোনা উৎপন্ন হবে নিয়ে যেও।"

সত্রাজিত মণিটি হাতছাড়া করতে চাইলেন না। ওঁর ভয় কৃষ্ণ হয়তো মণিটিকে নিয়ে নেবার মতলব করছেন।

সত্রাজিৎ বিনীত ভাবে বললেন, "হে প্রভু, বহু বৎসর ধরে সূর্যের উপাসনা করে

এই মণিটি পেয়েছি। একে আমার কাছে রাখবার ইচ্ছা। আমার বিশ্বাস স্বয়ং সূর্যদেব পছন্দ করবেন না এটা আমি হাতছাড়া করি। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি মণিটি চাইবেন না।"

কৃষ্ণ বললেন, "আমি ঐ মণি চাইছি না, মণিটিকে নিরাপদে রাখবার জন্য তোমাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। এ মণি তোমার সম্পত্তি—তুমি এটি বাড়ী নিয়ে যেতে পার বা তোমার যা ইচ্ছা তাই করতে পার।"

সত্রাজিৎ খুসী মনে বাড়ী ফিরে স্যমন্তক মণিটিকে যত্ন করে রেখে দিলেন। উজ্জ্বল মণি থেকে রোজই সোনা পাওয়া যেত। সত্রাজিৎ অল্প সময়ের মধ্যে খুব ধনী হয়ে গেলেন।

প্রসেনজিত নামে সত্রাজিতের এক ভাই ছিল। সে সুন্দর পোশাক ও দামী মণি-মুক্তার গহণা পরতে ভালবাসত। একদিন প্রসেনজিত অনেক সঙ্গীসাথীর সঙ্গে বনে শিকার করতে যাবে বলে তার সব থেকে ভাল পোষাক ও মূল্যবান সব হীরা



জহরতের গহনা পরল। তার মনে হল এর উপর স্যমন্তক মণি পরলে তাকে আরও সুন্দর দেখাবে।

প্রসেনজিত সত্রাজিতের কাছে মণিটি চাইল। সত্রাজিৎ প্রসেনজিতকে খুবই ভালবাসত তাই সে তাকে মানা করতে পারল না। সত্রাজিৎ ভাইকে মণিটি দিয়ে সেটিকে খুব সাবধানে রাখতে বললেন।

প্রসেনজিৎ উজ্জ্বল স্যমন্তক মণি পরে শিকারে গেল। সে দিন শিকার করতে তাদের খুব ভাল লাগছিল। প্রসেনজিত একটা বুনো শূয়োরের পেছনে ধাওয়া করেছিল। অনেকক্ষণ ধরে শূয়োরটার পিছনে ছোটার ফলে সে সঙ্গীদের থেকে অনেক দূরে গিয়ে পড়ল।





হঠাৎ একটা সিংহ তার উপর লাফিয়ে পড়ল।

প্রসেনজিৎ একলাই সিংহটার সঙ্গে লড়াই করল। লড়াইয়ে প্রসেনজিত মারা গেল।

সিংহটা স্যমন্তক মণির উজ্জ্বলতায় আকৃষ্ট হয়ে মণিটি নিয়ে চলে গেল।

একটা বড় বানর সিংহের কাছে মণিটা দেখতে পেল। মণির উজ্জ্বলতা তাকেও আকৃষ্ট করল।

বানরটার গায়ে খুব জোর ছিল। সে সিংহের পেছনে ধাওয়া করে সিংহটাকে মেরে ফেলল।

বানর স্যমন্তক মণিটি তার বাড়ীতে নিয়ে গেল। একটা মস্তবড় গুহায় বানরটা থাকত। সে বাড়ী ফিরে স্যমন্তক মণিটি বাচ্চাদের খেলতে দিল।

এদিকে সত্রাজিৎ ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। যারা প্রসেনজিতের সঙ্গে শিকারে গিয়েছিল তারা সবাই ফিরে এল কিন্তু কেউই প্রসেনজিতের কোন খোঁজ দিতে পারল না।

সত্রাজিৎ আশা করছিলেন যে প্রসেনজিত হয়তো শীঘ্রই ফিরে আসবে। কিন্তু অনেকদিন কেটে গেলেও প্রসেনজিত ফিরে এল না।

ভাইয়ের জন্য সত্রাজিতের খুব কষ্ট হল। তাঁর মনে পড়ল কৃষ্ণ তাঁর কাছে স্যমন্তক

মণি চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি দেন নি। এখন সন্দেহ হল হয়ত কৃষ্ণ প্রসেনজিতকে হত্যা করে স্যমন্তক মণিটি নিয়ে নিয়েছেন।

সত্রাজিৎ অনেকক্ষণ চিন্তা করলেন। চিন্তার ফলে তাঁর মনে কৃষ্ণের প্রতি সন্দেহ আরো বদ্ধমূল হল। কিন্তু তিনি নিরুপায়। কৃষ্ণ রাজা। রাজার বিরুদ্ধে হত্যা অথবা ডাকাতির অভিযোগ তো তিনি করতে পারেন না। সত্রাজিৎ তাঁর সন্দেহ মনে চেপে রাখতে পারলেন না। তিনি তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে



নিজের সন্দেহের কথা বললেন। তিনি সেই সঙ্গে তাদের অনুরোধ করলেন তারা যেন এ কথাটা গোপন রাখে।

সত্রাজিতের বন্ধুদের আবার নিজেদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। সত্রাজিত তাদের যা বলেছিল তারা তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সে কথাই বললে। পরে প্রত্যেকেই বলাবলি করতে লাগল যে কৃষ্ণ প্রসেনজিতকে হত্যা করে স্যমন্তক মণি নিয়েছেন।

এই বন্ধুরা আবার তাদের বন্ধুদের বললে। এভাবে কথাটা সর্বত্র রাষ্ট্র হয়ে গেল।

কিছুদিনের মধ্যে দেশশুদ্ধ সবাই বলতে লাগল যে কৃষ্ণ নিষ্ঠুরের মত প্রসেনজিতকে হত্যা করে স্যমন্তক মণি অপহরণ করেছেন।

স্ত্রীলোকদের মুখে একথা ছাড়া অন্য কোন কথা ছিল না। তারা তাদের ছেলে-মেয়েদের সাবধান করে দিয়ে বললে, "তোমাদের গহণা সামলে রেখ। সুযোগ পেলেই কৃষ্ণ গহণা চুরি করতে পারে।"

ছেলেমেয়েরা এই কথা শুনে ভয় পেল। তারা কৃষ্ণকে দেখলেই ভয়ে দৌড় লাগাত যদিও তারা আগে কৃষ্ণকে খুবই ভালবাসত।

একদিন কৃষ্ণ রাস্তার ধারে কয়েকজন বালককে খেলা করতে দেখলেন। তারা তাঁকে দেখে দৌড়ে পালালেও কৃষ্ণ তাদের কথা শুনতে পেলেন।

একটি বালক চীৎকার করে অন্যদের



বলছিল, "ছোট্, ছোট্, কৃষ্ণের কাছ থেকে ছুটে পালা। আমার মা বলেছে কৃষ্ণ চোর। সে বাচ্চাদের হত্যা করে গহনা নিয়ে নিতে পারে।"

এই কথা শুনে অন্য বালকেরা বললে যে তাদের মায়েরাও তাদের এই কথাই বলেছেন।

এ কথা শুনে কৃষ্ণ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁর নামে এই কুৎসা প্রচারের কারণ জানবার ইচ্ছা হল তাঁর।

কৃষ্ণ ছদ্মবেশে লোকেদের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কেউ তাকে চিনতে পারল না। নিজের নামে দেশময় যে কুৎসা রটেছে তিনি তাও শুনতে পেলেন। সকলেরই বিশ্বাস হয়েছিল কৃষ্ণ প্রসেনজিতকে হত্যা করে স্যমন্তক মণি ছিনিয়ে নিয়েছেন।



কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন নিজেকে তাঁর নির্দ্দোষ প্রমাণ করতে হবে। তা করতে হলে তাঁকে স্যমন্তক মণি যেমন করে হোক খুঁজে বার করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রসেনজিতের মৃত্যুর কারণও খুঁজে বার করতে হবে।

কৃষ্ণ তাঁর কয়েকজন মিত্রকে সঙ্গে নিয়ে স্যমন্তক মণির খোঁজে বার হলেন।

প্রসেনজিত যে বনে শিকার করতে গিয়েছিল সেখানে কৃষ্ণ ও তাঁর সঙ্গীরা

গেলেন। অনেকক্ষণ খোঁজার পর তারা প্রসেনজিতের মৃতদেহ পেলেন কিন্তু স্যমন্তক মণির কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

কৃষ্ণ ও তাঁর সঙ্গীরা খোঁজা বন্ধ করলেন না। শীঘ্রই তারা মৃত সিংহটাকে দেখতে পেলেন। সিংহের মৃতদেহের কাছে কয়েকটা পায়ের ছাপ তাদের নজরে পড়ল।

সেই পায়ের ছাপ ধরে এগিয়ে গিয়ে তাঁরা একটা মস্ত বড় গুহার মুখে পৌঁছলেন। দেখা গেল পায়ের ছাপগুলি সেই গুহার ভেতরে ঢুকে গেছে।

কৃষ্ণ তাঁর সঙ্গীদের বাইরে অপেক্ষা করতে বলে ভিতরে ঢুকলেন।

গুহার ভিতরটা খুবই চমৎকার। বেশ লম্বা একটা সুড়ঙ্গ পথ রয়েছে। দু' পাশের দেওয়ালে রামায়ণের ঘটনাবলীর সুন্দর সব ছবি আঁকা। কৃষ্ণ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ছবিতে রামায়ণের কাহিনী দেখতে দেখতে তিনি সুড়ঙ্গ পথে এগোতে লাগলেন। একটা বড় ঘরের সামনে এসে রামায়ণের কাহিনী ও সুড়ঙ্গ পথ শেষ হল। কৃষ্ণ বড় ঘরটার ভিতরে ঢুকলেন।

ঘরের মধ্যে কয়েকটি শিশু একটা অতি উজ্জ্বল মণি নিয়ে খেলছিল। কৃষ্ণ মণিটিকে দেখেই "স্যমন্তক মণি" বলে চিনতে পারলেন।

এক অপরিচিত লোককে দেখে বাচ্চারা ভয়ে চীৎকার চেঁচামিচি শুরু করে দিল।

হঠাৎ একটা গুরুগম্ভীর গর্জন শুনে কৃষ্ণ ফিরে দেখলেন, প্রকাণ্ড একটা বানর তাঁকে আক্রমণ করতে ছুটে আসছে। তিনি কেন এসেছেন এটা বুঝিয়ে বলার আগেই বানরটা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আত্মরক্ষা করা ছাড়া কৃষ্ণের আর অন্য কোন উপায় ছিল না।

কি ভয়ঙ্কর লড়াই হল। বানরটা যেমন কৃষ্ণকে আক্রমণ করে কৃষ্ণ তাকে হটিয়ে দেন। অনেকক্ষণ ধরে এ লড়াই চলল।

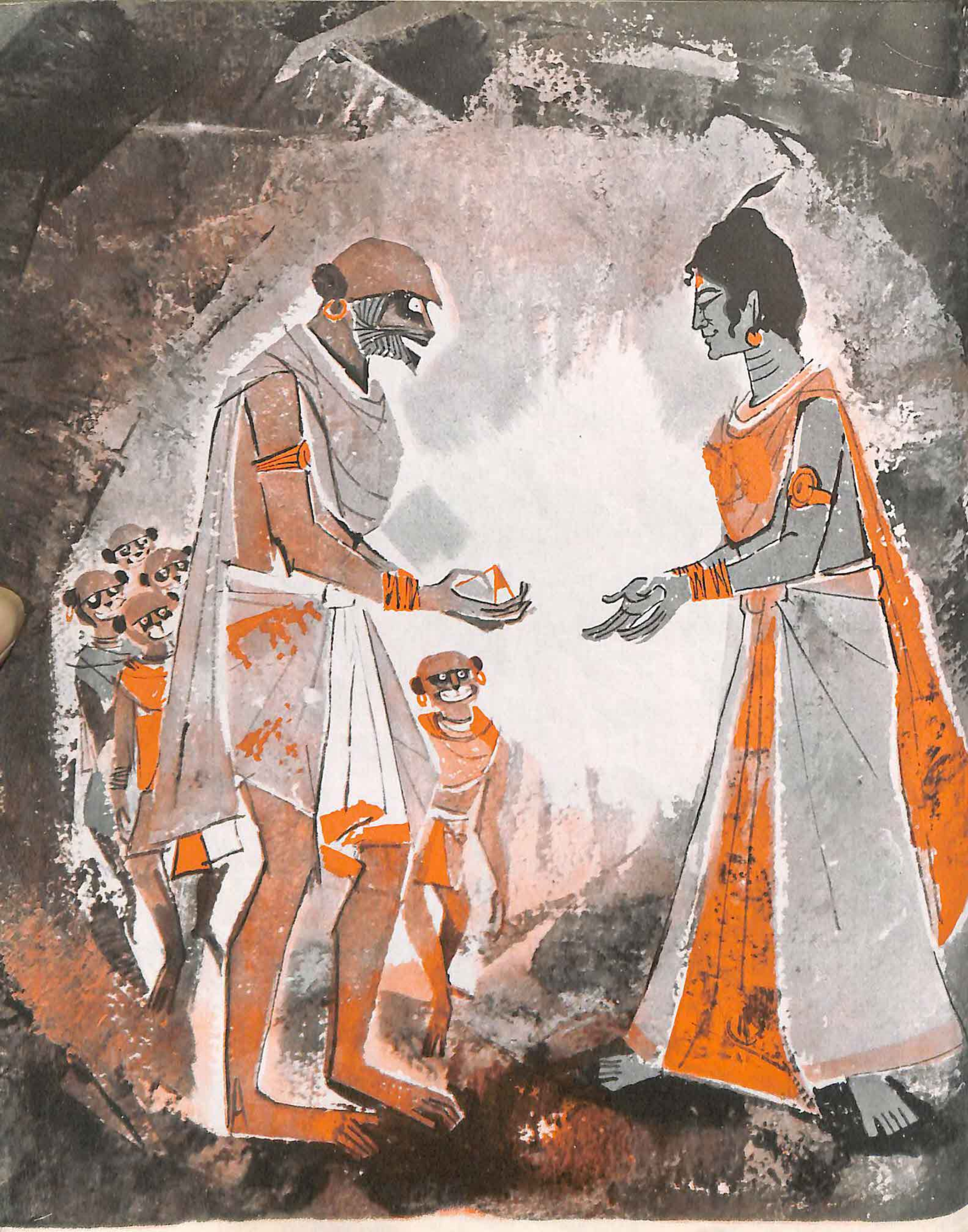
এই বানর কিন্তু যে সে বানর নয়। এ ছিল রামের দলের যোদ্ধা জাম্ববান। এখন বুড়ো হয়েছে, যুদ্ধ করা ছেড়ে দিয়েছে। সে তার ছেলেমেয়ে নাতি নাতনীদের নিয়ে ঐ সুন্দর গুহায় বাস করত।

এতদিন কেউ তাকে বিরক্ত করত না। হঠাৎ অপরিচিত কেউ এসে বাচ্চাদের ভয় দেখানোতে সে ভয়ানক চটে গিয়েছিল। সে অপরিচিত আগন্তুককে গুহা থেকে বার করে দিতে চেয়েছিল।

জাম্ববান কৃষ্ণের সঙ্গে লড়াই করতে লাগল। কৃষ্ণও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি লড়াই করতে লাগলেন। কেউ কারও কাছে হার স্বীকার করছেন না। দু' জনের ভীষণ লড়াইয়ে সমস্ত বন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

কৃষ্ণ লড়াই করতে সেখানে যাননি। তা ছাড়া রামায়ণের প্রবীন যোদ্ধার সঙ্গে লড়াই করার ইচ্ছাও তাঁর ছিল না। কৃষ্ণ চাইছিলেন লড়াই বন্ধ করতে। তাই





একবার কৃষ্ণ খুব জোরে এগিয়ে গিয়ে জাম্ববানকে ধরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন।

জাম্ববান খুব অবাক হয়ে গেল। সে কখনও কারো কাছে পরাজিত হয়নি। কে তাকে ফেলে দিল তাকে ভাল করে দেখতে লাগল। প্রথমে সে কৃষ্ণকে ভগবান বিষ্ণুরূপে দেখল। ক্রমশঃ তাঁর মধ্যে তার প্রভু শ্রীরামের মূর্তি দেখতে পেল।

জাম্ববান নিজের প্রভুর সঙ্গে লড়াই করেছে ভেবে দুঃখ পেল। সে কৃষ্ণের পায়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করল। কৃষ্ণ জাম্ববানকে আলিঙ্গন করে বললেন, "দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করতে হল। তোমার শরীরে আগের মতই ক্ষমতা আছে দেখে খুসী হলাম।"

আনন্দে জাম্ববানের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

তারপর দু'জনের মধ্যে নানা কথা হল। কৃষ্ণ তাঁর জঙ্গলে আসার কারণ জাম্ববানকে বললেন।

জাম্ববান বিনীত হয়ে নিবেদন করল, "প্রভু, যে অমূল্য রত্ন আপনি খুঁজছেন তা এখানে আছে। আমি একটি সিংহের কাছে এটা দেখি, আমি তার কাছ থেকে নিয়ে বাচ্চাদের ওটা খেলতে দিয়েছি।

জাম্ববান ভিতর থেকে স্যমন্তক মণি এনে কৃষ্ণকে দিল।

এতে সকলেরই খুব আনন্দ হল। জাম্ববানের ছেলেরা ও নাতিরা এসে শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদ চাইল।

কিছুক্ষণ পরে, কৃষ্ণ জাম্ববানের কাছে বিদায় নিয়ে গুহার বাইরে এলেন। গুহার বাইরে তাঁর সঙ্গীরা অপেক্ষা করছিল। তাদের নিয়ে তিনি সোজা সত্রাজিতের বাড়ী গেলেন।

সত্রাজিৎ স্যমন্তক মণি পেয়ে সন্তুষ্ট হল।

সে তখন কৃষ্ণের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইল। তার মিথ্যা সন্দেহ তাঁর নামে কুৎসা রটনার জন্য সে অনুতপ্ত এ কথা বলে সে কৃষ্ণের পায়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করল। সে কৃষ্ণকে স্যমন্তক মণি উপহার দিতে চাইল।

কৃষ্ণ স্যমন্তক মণি নিলেন না। তিনি যে নির্দোষ এটা প্রমাণ করতে পেরে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। শিশু বৃদ্ধ সকলেরই বিশ্বাস ও ভালবাসা যে ফিরে পেয়েছেন তাতেই কৃষ্ণের আনন্দ।

গয়



গয় নামে ইন্দ্রের এক অনুচর দ্বারকা নগরীর ভিতর দিয়ে একদিন জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছিল। সে সময় শ্রীকৃষ্ণ স্নান সেরে প্রাসাদে ফিরছিলেন। গয় শ্রীকৃষ্ণের এত কাছ দিয়ে তার ঘোড়া ছুটিয়েছিল যে ঘোড়ার ক্ষুরে উড়ানো মাটি ও কাদা কৃষ্ণের সারা শরীরে লেগে গেল। কৃষ্ণ তাতে ভীষণ রেগে গেলেন। তিনি চীৎকার করে গয়কে ঘোড়া থামাতে বললেন। গয় ঘোড়া থামালে কৃষ্ণ তাকে বললেন, "তোমার প্রথম অপরাধ শহরের মাঝখান দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়েছ আর দ্বিতীয়ত দেশের রাজার শরীরে মাটি ও কাদা ছিটিয়েছ। এ জন্য তোমার চরম শাস্তি হওয়া উচিত। তোমার অপরাধের জন্য তোমার প্রাণদণ্ড দেওয়া স্থির করেছি।" এই বলে কৃষ্ণ প্রাসাদের ভিতরে চলে গেলেন।

কৃষ্ণ প্রাসাদ থেকে বাইরে আসবার আগেই গয় তার ঘোড়ায় চড়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালিয়ে গেল। কৃষ্ণের ক্ষমতা গয়ের জানা ছিল। তাই তার মনে কোন সন্দেহ ছিল না যে, কৃষ্ণ তাকে শাস্তি দিয়ে তবে ছাড়বেন। সে স্থির করল দেবতাদের কাছে গিয়ে তাঁদের ওর প্রাণ বাঁচাতে বলবে।

গয় প্রথমে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে গেল। ইন্দ্র বললেন যে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে উনি কিছুই করতে পারবেন না, এবং গয়ের শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করাই ভাল।



এরপর গয় শিবঠাকুরের কাছে গেল। শিবঠাকুরও গয়কে সাহায্য করতে চাইলেন না। তিনিও গয়কে শ্রীকৃষ্ণের কাছে দয়া ভিক্ষা করতে বললেন।

শিবঠাকুরের কাছ থেকে ফেরবার সময় গয়ের সঙ্গে নারদ মুনির দেখা হল। গয় নারদকে সব কথা খুলে বলে তাঁর পরামর্শ চাইল। নারদ তো ঝগড়া বাধাতে পারলে আর কিছুই চান না। কিছুক্ষণ চিন্তা করে নারদ বললেন, "আমার মনে হয় আমি তোমাকে ভাল পরামর্শ দিতে পারব। অর্জুন হচ্ছেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি তোমায় রক্ষা করতে পারেন। শীঘ্র অর্জুনের কাছে গিয়ে তাঁর সাহায্য চাও। তিনি



নিশ্চয়ই তোমাকে সাহায্য করবেন। পাণ্ডবেরা এখন বনবাসে আছেন। কৃষ্ণ তোমাকে ধরে ফেলার আগেই সেখানে যাও।

গয় রওনা হবে এমন সময় নারদ তাকে থামিয়ে বললেন, "প্রথমে অর্জুনের কাছ থেকে তিনি তোমায় রক্ষা করবেন এই কথা নিয়ে তারপর কৃষ্ণের নাম করবে।" গয় এ কথায় রাজী হয়ে অর্জুনের কাছে যাবার জন্য রওনা হল।

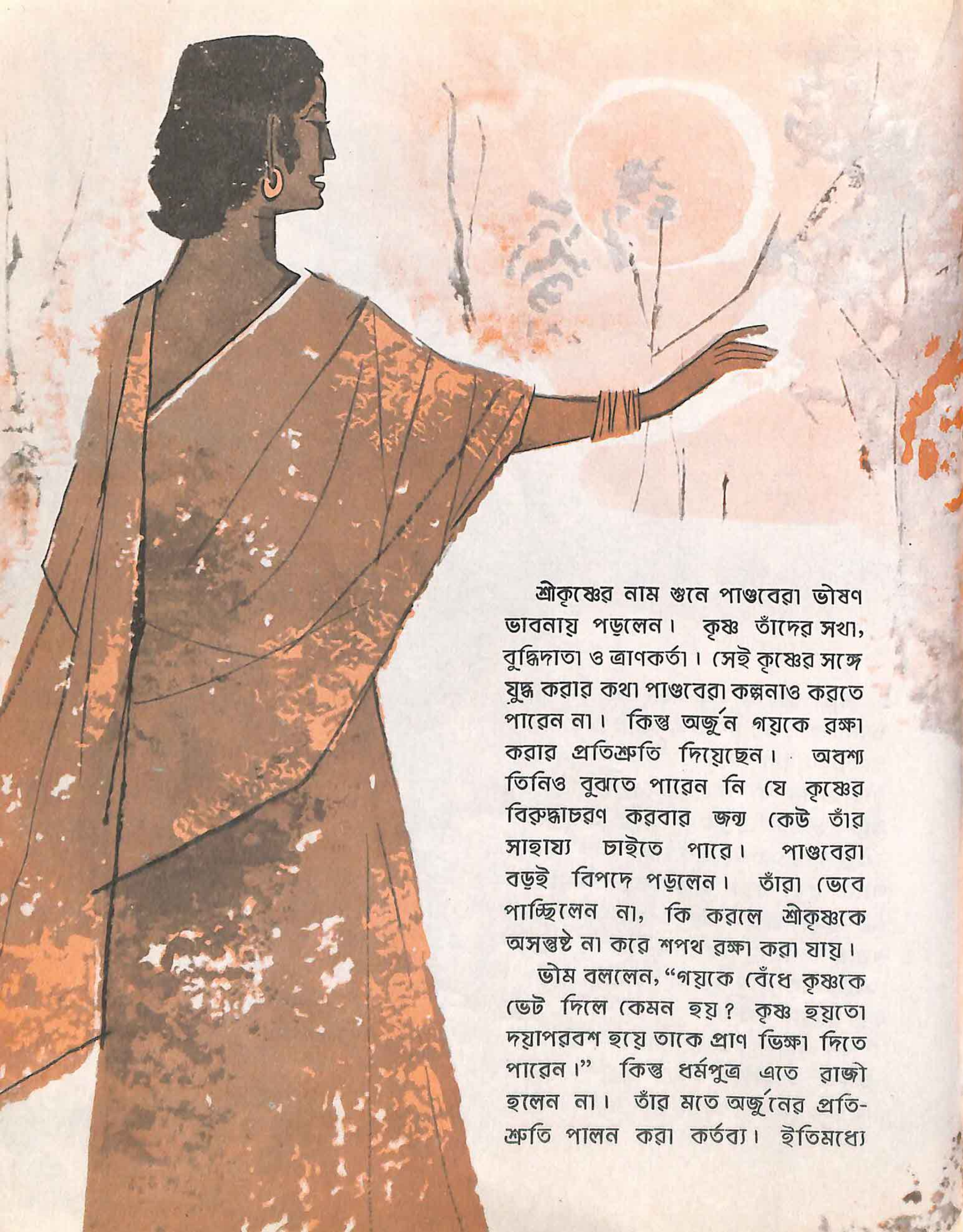
বনে পাণ্ডবেরা যেখানে ছিলেন সেখানে সে গেল। অর্জুনকে দেখে গয় তাঁর পায়ে পড়ল। অর্জুন তাকে তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন—সে কি চায়?

গয় উত্তর দিল, "হে, দেব অর্জুন, আমি অনেক দূর থেকে এসেছি। একজন আমায় হত্যা করতে চায়। সে আমার পিছনে আসছে এবং যে কোন মুহূর্তে সে এখানে এসে পড়তে পারে। আমি আপনার শরণাগত। আপনি আমার প্রাণ বাঁচান। আপনি ছাড়া কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, "গয়, কে তোমায় হত্যা করতে চায়? তার পরিচয় কি?"



গয় বললে, "যতক্ষণ না আপনি আমাকে অভয় দিচ্ছেন, আমি তার নাম বলতে পারব না।" অর্জুন বুঝতে পারছিলেন না তাঁর কি করা উচিত। তাঁর বড়ভাই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বললেন, "অর্জুন প্রাণরক্ষার জন্য কেউ শরণ নিলে তাকে রক্ষা করা রাজপুত্রের কর্তব্য।" এই কথা শুনে অর্জুন মনস্থির করে গয়কে বললেন, "যে কেউ তোমার শত্রু হোক তার হাত থেকে তোমায় রক্ষা করা আমার কর্তব্য।"

গয় আনন্দিত হয়ে শান্ত স্বরে বললে, "শ্রীকৃষ্ণ আমাকে হত্যা করতে চান, তাঁর হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন।"



শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনে পাণ্ডবেরা ভীষণ ভাবনায় পড়লেন। কৃষ্ণ তাঁদের সখা, বুদ্ধিদাতা ও ত্রাণকর্তা। সেই কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করার কথা পাণ্ডবেরা কল্পনাও করতে পারেন না। কিন্তু অর্জুন গয়কে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অবশ্য তিনিও বুঝতে পারেন নি যে কৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণ করবার জন্য কেউ তাঁর সাহায্য চাইতে পারে। পাণ্ডবেরা বড়ই বিপদে পড়লেন। তাঁরা ভেবে পাচ্ছিলেন না, কি করলে শ্রীকৃষ্ণকে অসন্তুষ্ট না করে শপথ রক্ষা করা যায়।

ভীম বললেন, "গয়কে বেঁধে কৃষ্ণকে ভেট দিলে কেমন হয়? কৃষ্ণ হয়তো দয়াপরবশ হয়ে তাকে প্রাণ ভিক্ষা দিতে পারেন।" কিন্তু ধর্মপুত্র এতে রাজী হলেন না। তাঁর মতে অর্জুনের প্রতিশ্রুতি পালন করা কর্তব্য। ইতিমধ্যে

নারদ এসে পৌঁছলেন। তাঁকে দেখে পাণ্ডবেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁরা নারদমুনিকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। পরে তাঁরা তাঁকে নিজেদের বিপদের কথা জানিয়ে তাঁর পরামর্শ চাইলেন।

নারদ বললেন, "তোমাদের প্রথম কর্তব্য গয়কে রক্ষা করা। এটা সত্যি যে কৃষ্ণ এটা পছন্দ করবেন না। এ নিয়ে কৃষ্ণ ও অর্জুনের মধ্যে যুদ্ধও হবে। তবে আমি এ কথা জোর দিয়ে বলতে পারি যে কৃষ্ণ পাণ্ডবদের মারবেন না।"

নারদ সেখান থেকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে গেলেন। কৃষ্ণ তখন গয়ের খোঁজে রওনা হচ্ছিলেন। নারদ বললেন গয়কে খোঁজবার দরকার নেই। আমি এখনি তাকে পাণ্ডবদের শিবিরে দেখে এসেছি। পাণ্ডবরা তাকে আশ্রয় দিয়েছে।



এমন কি তাকে রক্ষা করবার জন্যে অর্জুন আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত।

কৃষ্ণ খুবই আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে পাণ্ডবরা কখনো তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ যাতে না হয় তিনি সেই উপায় চিন্তা করছিলেন। কৃষ্ণ তাঁর বোন সুভদ্রাকে ডেকে বললেন, "তোমার স্বামী অর্জুন, গয়কে আশ্রয় দিয়েছে। গয়ের অপরাধের জন্য তাকে আমি প্রাণদণ্ড দেওয়া স্থির করেছি। গয়কে আমার হাতে সমর্পণ করতে তুমি অর্জুনকে বল। সে যদি আমার কথা না শোনে তবে আমি যুদ্ধ করে গয়কে কেড়ে আনব। অর্জুনের সঙ্গে আমার যুদ্ধে দু'জনের মধ্যে কোন একজনের মৃত্যু অনিবার্য। তুমি যদি আমাদের



ছু'জনকে জীবিত দেখতে চাও তবে অর্জুনকে বল গয়কে ছেড়ে দিতে।

সুভদ্রা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। স্বামী আর ভায়ের মধ্যে যুদ্ধ তিনি চাইছিলেন না। সুভদ্রা বুঝতে পারলেন, এই যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য তাঁর তাড়াতাড়ি কিছু করা উচিত।

পাণ্ডবের শিবিরে গিয়ে সুভদ্রা অর্জুনের সঙ্গে দেখা করলেন। কৃষ্ণের হাতে গয়কে সমর্পন করতে অনুনয় বিনয় করলেন। অনেক কান্নাকাটিও করলেন অর্জুনকে সম্মত করাতে। অর্জুনকে বুঝিয়ে বললেন, "কৃষ্ণকে অসন্তুষ্ট করা তোমাদের কোন মতেই উচিত হবে না।"

অর্জুন উত্তর দিলেন, "দেবি, আমি কৃষ্ণকে অসন্তুষ্ট করতে চাই না কিন্তু আমি রাজপুত্র; আমার একটা কর্তব্য আছে। গয়কে রক্ষা করব, আমি কথা দিয়েছি। অবশ্য আমি তখন জানতাম না যে কৃষ্ণ তাকে শাস্তি দিয়েছেন। এটা আমার দুর্ভাগ্য যে আমার কর্তব্য পালন করতে হয়ত কৃষ্ণের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে হতে পারে।

সুভদ্রা বিফল হয়ে কৃষ্ণের কাছে ফিরে গিয়ে অর্জুন তাকে কি বলেছেন, জানালেন। কৃষ্ণ হতাশ হয়ে সুভদ্রাকে বললেন, "আমার মনে হচ্ছে, আমি এ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করতে পারব না। ঈশ্বরের ইচ্ছা যে আমি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করি।"

শ্রীকৃষ্ণ গয়কে যে কোন প্রকারে বন্দী





করতে চাইছিলেন। কৃষ্ণ অনেক সৈন্য সামন্ত নিয়ে পাণ্ডবের শিবিরে উপস্থিত হলেন। শান্তিপূর্ণভাবে ব্যাপারটা মীমাংসা করার জন্য তিনি অর্জুনকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করলেন। কৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝিয়ে বললেন গয়ের অপরাধ কি, এবং তিনি কোন্ অপরাধে তাকে দণ্ড দেওয়া স্থির করেছেন। তিনি অর্জুনকে আরো জানালেন যে গয়কে তাঁর হাতে সমর্পন করলেই সকলের মঙ্গল।

অর্জুন বললেন, "হে প্রভু, ঈশ্বর সাক্ষী, আমার আপনাকে অসন্তুষ্ট করবার কোন ইচ্ছা নেই। গয়ের অপরাধের কথা এবং আপনি যে ওকে প্রাণদণ্ড দিয়েছেন আমি সে কথা জানতাম না। আমি তাকে কথা দিয়েছি যে আমি তাকে রক্ষা করব, সে কথা আমার রাখতেই হবে।"



কৃষ্ণ রেগে জোরে বলে উঠলেন, "বড় বড় কথা বলো না। হয় গয়কে সমর্পন কর নয়তো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।"

অর্জুন উত্তরে বললেন, "আমি যুদ্ধকে ভয় পাই না। আপনি যদি জোর করেন তবে আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত।"

কৃষ্ণ আর অপেক্ষা না করে তীর ছুঁড়ে যুদ্ধ আরম্ভ করে দিলেন। অর্জুনের গা স্পর্শ করবার আগেই তিনি তীরটাকে থামিয়ে দিলেন। কৃষ্ণ আর একটা তীর ছুঁড়লেন অর্জুন সেটাকেও থামিয়ে দিলেন। তারপর কৃষ্ণ একের পর এক তীর ছুঁড়তে লাগলেন কিন্তু একটাও অর্জুনের গায়ে লাগল না। কৃষ্ণ তখন নিজের সেনাদের যুদ্ধ করবার আদেশ দিলেন। পাণ্ডব সেনার সঙ্গে কৃষ্ণের সেনাদের ভয়ঙ্কর

যুদ্ধ আরম্ভ হল। যুদ্ধের দাপটে স্বর্গমর্ত কেঁপে উঠল। কৃষ্ণ একের পর এক শক্তিশালী অস্ত্র ব্যবহার করতে লাগলেন। অর্জুন আরো বেশী শক্তিশালী অস্ত্র দিয়ে নিজেকে রক্ষা করলেন। অনেকক্ষণ ধরে যুদ্ধ চলল। কিন্তু কোন পক্ষেরই জয় পরাজয় হল না।

কৃষ্ণ ধৈর্য হারিয়ে মারাত্মক সব অস্ত্র ব্যবহার করতে লাগলেন। কিন্তু অর্জুনের কাছেও সমান মারাত্মক অস্ত্র ছিল। শেষে কৃষ্ণ অর্জুনকে মারবার জন্য সব চাইতে





মারাত্মক অস্ত্র "সুদর্শন চক্র" বার করলেন। অর্জুনও 'সুদর্শন চক্রের' মত মারাত্মক "পাশুপাত" অস্ত্র নিয়ে তৈরী হলেন। এই অস্ত্র ব্যবহার করলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। পৃথিবীর মানুষ ও স্বর্গের দেবতারা এই ভয় করতে লাগলেন। অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে পৃথিবীর মানুষ ও স্বর্গের দেবতারা প্রার্থনা করতে লাগল। সমস্ত দেবতা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে সুদর্শন চক্র ব্যবহার না করতে কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করলেন। তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিলেন তাঁরা এ বিবাদের মীমাংসা করে দেবেন। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন দেবতাদের বক্তব্য শোনার জন্য নিজের নিজের অস্ত্র সংবরণ করলেন।

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা শান্তি স্থাপনের জন্য এগিয়ে এলেন। গয়কে তাঁর হাতে ছেড়ে দিতে তিনি অর্জুনকে বললেন। অর্জুন তাই করলেন। ব্রহ্মা গয়কে শ্রীকৃষ্ণের হাতে তুলে দিলেন। গয়কে হাতে পেয়ে কৃষ্ণ তার মাথা কেটে ফেললেন। ব্রহ্মা তখনি গয়ের মাথা ও শরীর জোড়া দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে দিলেন। গয় এমন ভাবে উঠে দাঁড়াল যেন কিছুই হয়নি। এমনি করে কৃষ্ণ আর অর্জুন দু'জনেই তাঁদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন।



Rs. 11.00 B 29 ISBN 81-7011-278-8